পরিবর্তনের পথে

ভারত যখন স্বাধীনতা লাভের পথে, দেশের প্রায় সব বড় বড় নেতারা মাউন্টব্যাটেনের ভারত বিভাজন পরিকল্পনা মেনে নিলেন। তথাকথিত ধর্মের নামে লোভ আর ঘৃণার রাজনীতি দেশজননীকে খণ্ডিত করল। ভারতের দুটো খণ্ডাংশ নিয়ে তৈরী হল পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তান ভাষাগত ভিন্নতার কারণে পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে বঞ্চিত অত্যাচারিত হতে লাগল। এরই প্রতিক্রিয়ায় ১৯৭১ সালে জন্ম নিল মুক্তিযুদ্ধ, যার পরিণতিতে বাংলাদেশের সৃষ্টি। বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল ভারতের সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ। সে সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের কিছু মানুষ স্বাধীন বাংলাদেশ তৈরীর বিরুদ্ধে ছিল এবং পাকিস্তানের অত্যাচারে শুধু যে সহায়তা করেছিল তাই নয়, নিজেরাও সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার চালিয়েছিল। এই দলের এক নেতার কঠোর শাস্তির দাবীতে এখন বাংলাদেশে যে শাহবাগ আন্দোলন চলছে, সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় উন্মাদনা প্রচার করে যারা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়, তারা তার ঘোর বিরোধী। এই নিয়ে মহা অস্থিরতা চলছে। বহু মানুষ এর মধ্যে মারা গেছেন।

মধ্যপ্রাচ্যের টিউনিশিয়া, মিশর, ইয়েমেন, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে গত কয়েক বছর ধরে একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপুল আন্দোলন চলেছে। কোথাও কোথাও এখনও চলছে। এই সব আন্দোলনের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে মিল আছে। এগুলোতে যারা যোগ দিচ্ছে, তাদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী, যারা অনেকেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, যারা অনেকেই ধর্মের নামে সংকীর্ণতা চায় না, ধর্মের নামে মানুষে মানুষে ভেদ চায় না। মুসলিম প্রধান এই দেশগুলোতে নতুন প্রজন্মের একটা বড় অংশ বোধ হয় আর পৌরোহিত্যের কবলে থাকতে চায় না। এদের আন্দোলন এক দিক থেকে দেখলে রাষ্ট্র ও পৌরোহিত্যের অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটা সরব প্রতিবাদ।

পাকিস্তানের সোয়াত অঞ্চলের ১৫ বছরের ছোট্ট মেয়ে মালালা ইউসুফজাই ১১-১২ বছর বয়েস থেকে ঐ পৌরোহিত্যের অত্যাচারের বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়েছিল। ইন্টারনেটে তালিবান গোষ্ঠীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ও নারী শিক্ষার পক্ষে তার লেখা বিদেশে সাড়া ফেলে দেয়। এর পরিণতি হল -- আততায়ীর গুলি লাগে তার মাথায় ও ঘাড়ে। বিদেশে অনেক চিকিৎসার পর মেয়েটি ভাল হয়ে উঠছে।

১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর শিকাগো ধর্ম মহাসভায় অভ্যর্থনার উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বারবার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছে এবং সমগ্র

জাতিকে হতাশায় মগ্ন করিয়াছে। এই-সকল ভীষণ পিশাচগুলি যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানবসমাজ আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইত। তবে ইহাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত।"

ধর্মের নামে, শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে যে পুরোহিত শ্রেণী মানুষকে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীতে বেঁধে রাখতে চায়, তাদের অস্বীকার করে সামনে এগোবার ডাক দিয়েছিলেন স্বামীজী। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, সব শাস্ত্রেই চিনিতে বালিতে মিশিয়ে আছে, বালিটা বাদ দিয়ে চিনিটা নিতে হয়। চিনি বলতে যেটা চিরন্তন সর্বজনীন সত্য, যা কল্যাণকর ভাব। আর বালি বলতে যা সত্য নয় বা যেসব বাহ্যিক রীতি নীতি বিশেষ স্থান-কালে হয়তো প্রযোজ্য ছিল, কিন্তু বর্তমানে কল্যাণকর নয়। সব ধর্মের পুরোহিত সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ উল্টো কাজটা করে। তারা চিনিটা বাদ দিয়ে বালিটা নিতে চায়, নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিতে চায়।

চিনি আর বালির বিচারে স্বামী বিবেকানন্দ মুক্ত মনের যুক্তি বিচার প্রয়োগ করতে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, "বেদের যতটুকু যুক্তিগ্রাহ্যও, ততটুকুই আমি গ্রহণ করি।" কিন্তু আধুনিক যুগের উদার বৈজ্ঞানিক মননশীলতার আলোয় যা যুক্তিগ্রাহ্য নয়, সেটাকে নিন্দা না করে ঐতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন স্বামীজী। ধর্মের নামে যা কিছু ঘটেছে, তার মূলে ধর্মের সনাতন সত্যগুলো ছিল না, বরং ছিল রাজনীতি, ছিল মানুষের লোভ ও বর্বরতা। আসল ধর্ম চিরকাল কল্যাণের বাণী শুনিয়েছে, সাম্য ও মৈত্রীর কথা শুনিয়েছে।

পবিত্র কোরানে আছে : নরহত্যার শাস্তিবিধান বা দেশে অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে একটি মানুষকে হত্যা করা সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করার সমতুল্য আর একটি মানুষের জীবন রক্ষা সমগ্র মানবজাতির জীবন রক্ষার সমতুল্য। (সুরা ৫:৩২)

এই কথাটা বহু উদ্ধৃত। কিন্তু চিনিটা নেবার মানুষ কম। অবশ্য সব ধর্মেই এমন মানুষ আছেন, যাঁরা যথার্থ ধার্মিক। শিকাগো ধর্ম মহাসভার বিদায় অধিবেশনে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "সাধুচরিত্র, পবিত্রতা ও দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কোন একটি বিশেষ ধর্মমণ্ডলীর নিজস্ব সম্পত্তি নয় এবং প্রত্যেক ধর্মপদ্ধতির মধ্যেই অতি উন্নত চরিত্রের নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।"

ঐ সব সাধুচরিত্র পবিত্র নরনারীর পুণ্য প্রভাবই হয়তো আজ সবার অলক্ষ্যে কাজ করছে, দেশে দেশে বহু যুবককে ভেদভাবের, সঙ্কীর্ণতার বেড়াজাল থেকে বের করে আনছে। বিশেষ করে বিগত একশ বছরে সারা পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের চেতনায় এই বিবর্তন ঘটে চলেছে। ইতিহাসের নিয়ম মেনে বিভিন্ন সমাজ ও সম্প্রদায় বিবর্তনের বিভিন্ন পথে ও বিভিন্ন স্তরে আছে। এই অগ্রগতিতে অর্থনীতি ও পাশ্চাত্যের জড়বাদের ভূমিকা কিছু আছে,

কিন্তু সেই ভূমিকা প্রধানতঃ নেতিবাচক -- সেই ভূমিকা শুধু প্রাচীন সংস্কারগুলোকে ভেঙে ফেলায় । গড়ার কাজটা কে করবে? কারোর ভাবে আঘাত না দিয়ে প্রত্যেকের ভালটা দেখিয়ে দেওয়া, চিনিটাকে চিনিয়ে দেওয়া, প্রত্যেককে তার নিজের পথে এগোতে উৎসাহ দেওয়া -- এটা কে করবে ?

প্রত্যেক ব্যক্তি, জাতি, সমাজ ও সম্প্রদায়কে নিজের উদ্ধার নিজেকেই করতে হবে । অন্য কেউ তার হয়ে এ কাজ করে দিতে পারবে না । এগোতে হলে মনকে মুক্ত করতে হবে । অতীতে যা কিছু ভাল জিনিস ছিল, সেগুলো নিতে হবে, কিন্তু নির্বিচারে অতীতকে আঁকড়ে ধরে থাকলে এগোনো সম্ভব নয় । তাই দেশে দেশে যুবকেরাই অগ্রগতির পতাকা-বাহক । "মুক্তির মন্দির-সোপানতলে" জীবন সমর্পণেই যুবকের জীবনের সার্থকতা । এই সব আন্দোলনের উত্তেজনায় তার এই আকূতির বহিঃপ্রকাশ । কিন্তু জরাজীর্ণ বিপুল অচলায়তনের পরিবর্তন ঘটিয়ে তার মধ্যে নবীন প্রাণ সঞ্চার করাটা পুনর্গঠনের কাজ । সেই কাজ প্রতিবাদের চেয়ে শক্ত । এই আসল কাজে, গড়ার কাজে সফল হতে হলে ধীর, স্থির, অথচ দৃঢ় ভাবে একটানা কাজ করে যেতে হবে । এই কাজে আত্মত্যাগের প্রয়োজন কমে যায় না, কমে যায় সাময়িক উত্তেজনার ঘনঘটা । সেই কাজ করবার যোগ্যতা আপনা থেকে আসে না, অর্জন করতে হয় । তাই যৌবনের মুখ্য সাধনা জীবন গঠন ।

যথার্থ পরিবর্তনের গোড়াপত্তন নিজের জীবনের পরিবর্তন দিয়ে । সত্য, সাম্য, মুক্তি -- এই আদর্শগুলো ধারণের উপযুক্ত করে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে । নিজের জীবন হবে নিঃস্বার্থ, সকলের কল্যাণে নিবেদিত । অন্তরে কোনও ভেদভাব থাকবে না । তা না হলে আজকের আন্দোলনের পুরোধা যারা, তারাই আগামী কালের শোষক হয়ে উঠবে, এমন সম্ভাবনা থেকেই যাবে । পৃথিবীর ইতিহাসে বোধ হয় এমন উদাহরণই বেশী । অতীতের ভ্রান্ত পথে বারবার না চলে আমরা যেন জীবন গঠনের জন্য প্রযত্ন করি, যাতে আমাদের নতুন নেতৃত্ব হয় যথার্থই নিঃস্বার্থ, সৎ ও মানবপ্রেমিক ।